আগুনে পুড়িয়ে হত্যা

বেড়েই চলেছে এর ভয়াবহতা

লিখেছেন **শাহিদুজ্জামান মাসুদ**

আগুনে পুড়িয়ে প্রতিহিংসামূলক হত্যা বা আহত করা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এর অধিকাংশ শিকার হচ্ছেন সাধারণ নারীরা। মহিলা মন্ত্রণালয়ের ২০০১ সালে প্রকাশিত রিপোর্টে দেখা যায়, নির্যাতিত হয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় শতকরা ৩০ ভাগ নারী। তাছাড়া যৌতুকের দাবিতে স্বামী স্ত্রীকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যাও করছে নির্মমভাবে। গত জুলাই, আগস্ট এবং সেপ্টেম্বর মাসে শুধু পেট্রোল, কেরোসিন কিংবা মবিল গায়ে ঢেলে দিয়ে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছে প্রায় ১২ জন নারীকে। দিন দিন আগুনে পুড়িয়ে নির্মমভাবে হত্যা করার প্রবণতা বেড়ে যাচ্ছে আশঙ্কাজনক হারে।

ঢাকার বাড্ডা এলাকার জোয়ার সাহারা মলিপাড়ার বাসিন্দা আজিজুল হকের সঙ্গে শামীমার বিয়ে হয় বেশ কিছুদিন আগে। বিয়ে হওয়ার পর সুখেই কাটছিল তাদের সংসার জীবন। কিন্তু গত ছয় মাস ধরে বেকার আজিজুল ১ লাখ টাকা যৌতুকের দাবিতে শামীমাকে মারধর শুরু করে। মেয়ের সুখের কথা ভেবে গরিব নওয়াব আলী জমিজমা বিক্রি করে ৪০ হাজার টাকা আজিজুলের হাতে তুলে দেয়। কিন্তু আজিজুল তার শ্বশুরের কাছে আরো ৫০ হাজার টাকা দাবি করে। নওয়াব আলী সেই দাবি পূরণ করতে পারেনি। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে আজিজুল শামীমাকে মারধর করে তার বাবার বাড়িতে বরুরায় পাঠিয়ে দেয়। গত কয়েক দিন ধরে আজিজুল শামীমাকে অব্যাহত তালাক দেয়ার হুমকি দেয়ায় শামীমা দিশেহারা হয়ে পড়ে। নিজের ভবিষ্যতের কথা ভেবে শামীমা শঙ্কিত হয় দিন দিন। তারপর গর্ভে ৭ মাসের সন্তান।

পাগলিনী প্রায় শামীমা স্বামীর নির্যাতন থেকে রেহাই পেতে রাতের অন্ধকারে ঘরের বাইরে গিয়ে নিজ শরীরে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। ঘটনাটি ঘটে গত ১০ সেপ্টেম্বর। পৃথিবীর সব মায়া-মমতা ত্যাগ করে নিজেই নিজের ভাগ্য নির্ধারণ করলেন শামীমা জীবন উৎসর্গ করে।

হোসনে আরার পিতার বাড়ি নারায়ণগঞ্জ শহরের ইমদাইরে রেলওয়ে পুলের পাশেই। তার বাবা মারা গেছেন কয়েক বছর আগে। দুই ভাই, পাঁচ বোন আর মাকে নিয়ে হোসনে আরার সংসার।

হাসপাতালে শুয়ে মৃত্যুর প্রহর গুনছেন অগ্নিদগ্ধ শাহেলা। ঘটনাটি ২ সেপ্টেম্বরের। নোয়াখালীর সেনবাগ উপজেলার পলতি সাতবাড়িয়া গ্রামের শাহেলার সঙ্গে দেড় বছর আগে পাশের গ্রাম পলতি তাড়াবাড়িয়ার কামাল হোসেনের বিয়ে হয়। শাহেলা জানান, বিয়ের পর থেকেই স্বামী, শ্বশুর, ননদ, সৎ শাশুড়ি মিলে নানাভাবে তাকে নির্যাতন করতো। নির্যাতন সইতে না পেরে শাহেলা একবার আত্মহত্যা করার জন্য গিয়েছিল। কিন্তু লোকজন দেখে ফেলায় সে যাত্রায় বেঁচে যায় শাহেলা। তবে এখন গ্রাম্য সালিশে তাকে ভর্ৎসনা করে সাদা কাগজে সই নেয়া হয়, এখন শাহেলার মনে হচ্ছে, তখন আত্মহত্যা করতে পারলেই বেঁচে যেত। এখন বেঁচে থেকে মৃত্যু যন্ত্রণা সইতে হতো না।

গত শনিবার রাতে মর্জিনা ও শাহজাহানসহ বিধবা নূরজাহানের পরিবারের ৬ সদস্য ঘুমিয়ে ছিল। নূরজাহান এ সময় ব্যক্তিগত কাজে চট্টগ্রাম ছিলেন। রাত ১১টার দিকে স্থানীয় সোবহান ও মোশারফের নেতৃত্বে একদল সন্ত্রাসী ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়। আগুন দেখে প্রতিবেশীরা এগিয়ে এলেও সন্ত্রাসীদের হুমকির কারণে উদ্ধারকাজে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকে। আগুনে ঘরে রাখা কিছু টাকাসহ সব জিনিসপত্র পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

সন্ত্রাসীরা চলে যাবার পর দগ্ধ অবস্থায় মর্জিনাকে উদ্ধার করে এলাকাবাসী। ততক্ষণে মর্জিনা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

আগুনে পুড়িয়ে যাদেরকে আহত করা হয়, তারা সামাজিকভাবে খুবই নাজুক

অবস্থায় থাকে। যেহেতু আগুনে পোড়ানো ঘটনার প্রত্যেকটির পেছনে কাজ করে যৌতুক। তাই আহত গৃহবধূকে তার স্বামী আর গ্রহণ করে না। পাশাপাশি মেয়েটি বাড়িতে ফেরত গেলেও তার বাবা-মা এবং প্রতিবেশীদের দ্বারা মৌখিকভাবে আক্রান্ত হন বার বার। তাই স্বাভাবিকভাবেই মেয়েটি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে।

নারী নির্যাতন প্রতিরোধ আইন

দাহ্য পদার্থ

বিষাক্ত পদার্থ : ক্লোরিন, ব্রোমিন, আয়োডিন, ফসফরাস, আর্সেনিক, নাইট্রিক এসিড, কার্বলিক এসিড, এসিটিক এসিড ইত্যাদি।

দাহ্য পদার্থ : পেট্রোল, অকটেন, ডিজেল, পেরোফিরিন ও স্পিরিট।

ধারা-৪। দহনকারী, দগ্ধকারী পদার্থ দ্বারা সংঘটিত অপরাধের শাস্তি।

(১) যদি কোনো ব্যক্তি দহনকারী, ক্ষয়কারী অথবা বিষাক্ত পদার্থ দ্বারা কোনো শিশু বা নারীর মৃত্যু ঘটায় বা মৃত্যু ঘটানোর চেষ্টা করে, তা হলে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হবে এবং এর অতিরিক্ত অনূর্ধ্ব এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হবে।

(২) যদি কোনো ব্যক্তি কোনো দহনকারী, ক্ষয়কারী বা বিষাক্ত পদার্থ দ্বারা কোনো নারী বা শিশুকে এমনভাবে আহত করে যার ফলে উক্ত নারী বা শিশুর দৃষ্টিশক্তি বা শ্রবণশক্তি নষ্ট হয় বা শরীরের কোনো অঙ্গ, গ্রন্থি বা অংশ বিকৃত হয় বা নষ্ট হয় বা তার শরীরের অন্য কোনো স্থান আহত হয়। তাহলে উক্ত নারী বা শিশুর-

(ক) দৃষ্টিশক্তি বা শ্রবণ শক্তি নষ্ট বা মুখমণ্ডল, স্তন, যৌনাঙ্গ বিকৃত বা নষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে উক্ত মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হবে এবং এর অতিরিক্ত অনূর্ধ্ব এক লক্ষ টাকার অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হবে।

(খ) শরীরের অন্য কোনো অঙ্গ, গ্রন্থি বা অংশ বিকৃত বা নষ্ট হওয়ার বা শরীরের কোনো স্থানে আঘাত পাওয়ার ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি অনধিক চৌদ্দ বছর কিন্তু অন্যূন সাত

গত পাঁচ বছরে দেশে নারী ও শিশু নির্যাতনের চিত্র

সময়	ধর্ষণ	এসিড নিক্ষেপ	গুরুতর আহত	অন্যান্য	মোট	শিশু নির্যাতন
১৯৯৭	১৩৩৬	১১৭	২০৬	৪১৮৪	৫৮৪৩	৪৫৩
১৯৯৮	২৯৫৯	১৩০	২০০	৪০৯৮	৭৩৮৭	৬৭৬
১৯৯৯	৩৫০৪	১২২	২৩৯	৪৮৪৫	৮৭১০	৫৫৯
২০০০	৩১৪০	১২৭	২৯৭	৬৯৭১	১০৫৩৫	৪৪৯
২০০১	৩১৮৯	১৫৩	৩৫১	৯২৬৫	১২৯৫৮	৩৮১
মোট	১৪১২৮	৬৪৯	১২৯৩	২৯৩৬৩	৪৫৪৩৩	২৫১৫

সূত্র : পুলিশ সদর দপ্তর

শিশু যখন সমাজ রাজনীতির শিকার

লিখেছেন পারভীন তানি

বোনকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল। বোন রাজি হয়নি। পরিণতিতে প্রাণ দিতে হয়েছে ভাই ওমর সানিকে। ঘটনাটি গুলশান থানার নন্দা এলাকার। রাত আনুমানিক ৯টা। বাড়ির সামনে থেকে পাড়ার বখাটে যুবক খোকন ওমর সানিকে মাছ ধরার কথা বলে একটি নির্মাণাধীন বাড়িতে নিয়ে যায়। ওমর সানির বয়স ছয়। এখানেই তাকে হত্যা করা হয়। লাশ চৌবাচ্চায় ফেলে দেয়। ছয় বছরের সানি জানলো না কেন তাকে হত্যা করা হলো? কী তার অপরাধ? শুধু সানি নয়; বাপ্পী, শিহাব, রত্না- এরাও নিহত হয়েছে। এই নিষ্পাপ শিশুদের হত্যা করেছে মানুষরূপী যুবকরাই। এই হত্যাকান্ডগুলোর পর প্রশ্নটি খুব জোরালোভাবে সামনে চলে এসেছে, কেন এই হত্যাকান্ড? সমাজের অবক্ষয়ের কথা আমরা সবাই জানি। বহুদিন ধরেই এটা একটা আলোচিত বিষয়। কিন্তু সেই অবক্ষয়ের মাত্রা এতোটা বাড়লো কেন? শিশু হত্যার পর্যায়ে চলে এলো কেন?

সামাজিক অস্থিরতাই কী একমাত্র কারণ? কোনো অপরাধেরই বিচার হয় না– এটাও কী একটা কারণ? বর্তমানে আমাদের সামাজিক প্রেক্ষাপটের দিকে তাকালে দেখা যাবে রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রভাব। নৈতিক অবক্ষয় চরম আকার ধারণ করেছে। শিশু নির্যাতন বাড়ছেই। গত কয়েক মাস ধরে শিশু অপহরণ, নির্যাতন ও হত্যা আশঙ্কাজনক হারে বেড়ে চলেছে। নেই কোনো শাস্তির ব্যবস্থা। শিহাব হত্যা মামলার রায় বের হলেও সেটা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হিসেবে মানতে চাইছেন না অনেকেই। এসব শিশু হত্যাকারীদের সবারই বয়স ১৮ থেকে ২৫-এর মধ্যে। কোন মানসিকতায় তারা শিশু হত্যা করছে? বিষয়টি জানার জন্য আমরা কথা বলেছিলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপিকা ড. সাদেকা হালিমের সঙ্গে। তিনি সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'শিশু হত্যা বর্তমানে একটি নতুন ধারা। বেশ কয়েক বছর ধরে আমরা নারী হত্যা দেখে আসছি। এখন পাশাপাশি এসেছে শিশু হত্যা। এই দুই শ্রেণীকে আঘাত করা, নির্যাতন করা, হত্যা করা খুব সহজ। এর সামাজিক যে কারণগুলো তার মধ্যে প্রধান নারীকে

বছরের সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হবে এবং এর অতিরিক্ত অনূর্ধ্ব পঞ্চাশ হাজার টাকার অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হবে।

কিছু ঘটনা

* অগ্নিদগ্ধ কোনো কিছুর দ্বারা আঘাত করে পুড়িয়ে দিলে তা গুরুতর জখম বলে গণ্য হবে।

* কান কেটে নেয়া, কপালে দাগ দেয়া, গাল পুড়িয়ে বা এরূপ কোনো কাজ যা দ্বারা বিকৃত ঘটানো যায়, নাকের ওপর আঘাত ও বিকৃত ঘটায়।

* ঘাড়ের কোনো গুরুত্বপূর্ণ অংশে বড় দা বা রাম দা, তলোয়ার দিয়ে আঘাত করে কেটে ফেলাকে অপরের অনিষ্ট সাধন বলা হয়েছে।

নারী নির্যাতনের পরিসংখ্যান : নারী ও শিশু নির্যাতনের বর্তমান চিত্র দেশের সচেতন মহলেও উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে। পুলিশের নথি এবং বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার প্রতিবেদনে যার যথার্থতা পাওয়া যায়।

সারা দেশে চলতি বছরের প্রথম আট মাসে নারী নির্যাতনের শিকার হয়েছেন প্রায় ৬ হাজার জন। এদের মধ্যে হত্যা ৩২৮৫ জন, ধর্ষণ ৯৪৮ জন, যৌতুকের শিকার ২৩৭ জন, এসিড সন্ত্রাসের শিকার ৩০৯ জন, অপহরণ ৯৯৭ জন, ফতোয়াবাজির শিকার হয়েছেন ২১ জন এবং আত্মহত্যা করেছেন ৭৪১ জন। তথ্য : IDR.

এছাড়াও জুন-আগস্ট ২০০২ এই তিন মাসে ধর্ষণের শিকার হয়েছেন ৩১২ জন নারী, গণধর্ষণ ৯২টি, গণধর্ষণের পর হত্যা ৩১টি। ধর্ষণের শিকারদের মধ্যে ছিলেন ৩ বছরের শিশু থেকে ৬৫ বছরের বৃদ্ধা পর্যন্ত। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে, খুনি, ধর্ষক ও এসিড নিক্ষেপকারীর ভূমিকার সর্বাধিক সংখ্যক উপস্থিতি দেখা গেছে স্বামীদের।

সীমিত সংখ্যক ব্যতিক্রম বাদ দিলে পুলিশের ভূমিকা ছিল বরাবরই রহস্যজনক। প্রায়ই মামলা গ্রহণে স্থানীয় থানার গড়িমসির খবর পাওয়া গেছে অথবা মামলা গ্রহণ করলেও আসামিকে পাকড়াও করার কোনো গরজ তাদের মধ্যে দেখা যায়নি। তথ্য : নারী প্রগতি সংঘ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞানের অধ্যাপক ও উইমেন ফর উইমেনের সদস্য ড. মাহমুদা ইসলামের মতে, অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না হওয়ায় নির্যাতনের বিষয়টি এখন ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। ঘটনা ঘটার পরে ব্যবস্থা নেয়ার চেয়ে আগেই প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং নারী, শিশুর নিরাপত্তা জোরদার করার পক্ষে তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।

মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক হামিদা আক্তার বেগম নারীর প্রতি সহিংসতার কারণ হিসেবে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর অকার্যকর ভূমিকাকেই প্রধানত দায়ী করেছেন।

মামলার দীর্ঘসূত্রতাকে নির্যাতন প্রতিরোধে একটি বড় অন্তরায় হিসেবে অভিহিত করেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি নাইমুদ্দিন। তিনি বলেন, বিচার বিভাগের ওপর মানুষের আস্থা বর্তমানে নেই বললেই চলে।

আইন লঙ্ঘনের প্রবণতা, মানুষের মনস্তাত্ত্বিক বিপর্যয়ও এর অন্যতম প্রধান কারণ। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের একমাত্র উপায় হিসেবে তিনি কঠোর ও ত্বরিত ব্যবস্থার মাধ্যমে চাঞ্চল্যকর মামলাগুলো দ্রুত

দেখা হচ্ছে দুর্বলভাবে। শিশুও তেমনি। শিশুকে অসহায় ভেবে তাকে হত্যা করা সহজ। যৌতুকের কারণে, প্রেমে ব্যর্থ হয়ে, জমিজমা সংক্রান্ত বিবাদ, দুই পরিবারের মধ্যে বিবাদ ইত্যাদি কারণে শিশু হত্যা হচ্ছে। অনেক সময় দেখা যাচ্ছে একটা আক্রোশ কাজ করছে। একটা নারীকে হত্যা করতে অনেক বেশি পরিকল্পনা করতে হয়, সুযোগের অপেক্ষায় থাকতে হয়। এখানে একটা শিশুকে ধরে নিয়ে হত্যা করা সহজ। এর সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে সামাজিক অবক্ষয়। এই সামাজিক অবক্ষয়ের প্রধান কারণ নৈতিক অবক্ষয়। আমাদের রাজনীতিতে অসুস্থ প্রতিযোগিতা বেড়ে গেছে। রাজনীতি এখন সন্ত্রাসনির্ভর। এই প্রতিযোগিতার বহিঃপ্রকাশ ঘটছে বিভিন্নভাবে। এখন যারা শিশু হত্যা করছে তারা একটা বিশেষ শ্রেণী। এদের বয়স খুবই কম। যারা এসব করছে তারা রাজনৈতিক আশ্রয়েই করছে। বাংলাদেশের কোনো কিছুই পুরোপুরিভাবে নিরপেক্ষ নয়, সবখানেই রাজনৈতিক প্রভাব আছে। শিহাব হত্যার বিচার একটা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। সুষ্ঠু বিচার মাধ্যমে এ ধরনের ঘটনার অপরাধীকে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করা হলে অন্যরা ভয় পাবে। তাহলে এ ধরনের অপরাধ কমে আসবে। এখানে রাষ্ট্রের একটা বড় ভূমিকা আছে। জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্রের অনেক সংস্থা আছে। এর মধ্যে প্রধান পুলিশ বাহিনী। সেই পুলিশ বাহিনী এখন তার দায়িত্ব পালনে তৎপর থাকে না। ফলে সন্ত্রাস খুব সহজে বাড়তে পারছে। ওখানে সরকারের আরো সচেতন হওয়া প্রয়োজন। আন্তরিক হওয়া প্রয়োজন। এছাড়া রাজনীতিবিদদের কমিটমেন্ট থাকা প্রয়োজন, সরকারের তো অবশ্যই। রাজনৈতিক কমিটমেন্ট না থাকলে এই ইস্যুগুলো মোকাবেলা করা কঠিন।'

শুধু যে সামাজিক কারণ তা নয়। এর মানসিক দিক উল্লেখ করে ঢাকা মিটফোর্ড হাসপাতালের সহকারী অধ্যাপক ডা. দেওয়ান আবদুর রহিম ২০০০কে বলেন, শিশু নির্যাতন ও হত্যার পেছনে যথেষ্ট মানসিক কারণ রয়েছে। ব্যক্তিত্বের ভারসাম্যহীনতা এর একটি অন্যতম কারণ। এছাড়াও রয়েছে আবেগের তীব্রতা, অন্যকে নকল করার প্রবণতা ইত্যাদি। আজকাল টিভিতে বিভিন্ন ভায়োলেন্সের ছবি, অপহরণের মাধ্যমে দ্রুত উপার্জন একটি বিশেষ বয়সকে করে তুলেছে উন্মাদ। নিয়ে যাচ্ছে তাদের অপরাধের দিকে। একটি শিশু তার আশপাশের পরিবেশে যদি অস্বাভাবিক আচরণ দেখে তাহলে তার মধ্যে সেরকম মানসিকতার বিকাশ ঘটে। পারিবারিক অশিক্ষা, দ্বন্দ্ব একজন মানুষের মূল্যবোধ অবক্ষয়ের বিরাট কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অনেক সময় তার মানসিক রোগ দেখা দেয়। পরবর্তীতে আক্রোশে পরিণত হয়। এর প্রতিফলন ঘটে বর্তমান শিশুটির ওপর হত্যা বা নির্যাতনের মাধ্যমে। এই মানসিকতা প্রধানত দেখা যায় উচ্চ মহলে এবং নিম্ন মহলে। নিম্ন মহলে একটা কিশোরের সঠিক মানসিক বিকাশ হয় না। অপরদিকে উচ্চ মহলে অতি প্রাচুর্যে বিষণ্নতা কাজ করে, যা তাদের খুন বা নির্যাতনের মতো উত্তেজক কাজে আগ্রহী করে তোলে। যেসব শিশুর ওপর নির্যাতন করা হয় তার বয়সে ওই আচরণটি ঠিকভাবে বুঝে ওঠে না। পরবর্তীতে জ্ঞান-বুদ্ধির বিকাশ ঘটলে এর শারীরিক ও মানসিক প্রভাব হয় মারাত্মক। মানসিকভাবে সে বিষণ্নতায় ভুগতে থাকে। এই বিষণ্নতা থেকে সে অনেক খারাপ কাজে অনুপ্রাণিত হয়। মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে, ব্যক্তিত্বের অবনতি ঘটে। এটা অনেকটা সার্কেলের মতো কাজ করে। শারীরিকভাবে হয়তোবা সে হয়ে পড়ে মৃগীরোগী। নির্যাতনের কারণে তার কোনো অঙ্গহানি হয়। সে পঙ্গু হয়ে যায়। সমাজে চলাচলের মানসিকতা হারিয়ে ফেলে। এই সার্কেল থেকে বেরিয়ে আসতে আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক সচেতনতা দরকার। বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমের সহায়তায় গণসচেতনতা গড়ে তুলতে হবে। সমাজকে হতে হবে রাজনীতির কলুষমক্ত। সরকারকে নিতে হবে যথাযোগ্য পদক্ষেপ। আইনের সঠিক প্রয়োগ, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, সুস্থ বিনোদন শিশু হত্যা ও নির্যাতনের মাত্রা কমিয়ে আনতে সক্ষম।

ছবি : **আনোয়ার মজুমদার**

নিষ্পত্তির ওপর গুরুত্ব দেন।

নারী নির্যাতনের বর্তমান পরিস্থিতিতে সরকারি মহলও উদ্বিগ্ন এবং এর প্রতিরোধে বিভিন্ন পদক্ষেপ সরকার নিয়েছে। মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব ফেরদৌস আরা বেগম ২০০০কে বলেন, নারী নির্যাতন বন্ধে প্রস্তাবিত ৩৫টি বিশেষ ট্রাইব্যুনালের মধ্যে ১৮টির অনুমোদন তারা এরই মধ্যে পেয়েছেন। বাকিগুলো প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়া এরই মধ্যে মন্ত্রণালয় নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সেল গঠন করে প্রতিটি ঘটনার জন্য বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

আমেরিকা, ইউরোপের মতো সভ্য দেশে একজন নারী বা পুরুষ তাদের নিজস্ব দাবি পূরণের জন্য নিজ গায়ে পেট্রোল ঢেলে আগুন লাগিয়ে আত্মাহুতি দিতো। ফলশ্রুতিতে তার ত্যাগের বিনিময়ে প্রতিষ্ঠিত হতো তার দাবিটি। টনক নড়তো সমাজ বিজ্ঞানীসহ শাসক-শোষক সবশ্রেণীর।

সভ্যদেশের একজন নাগরিক তার নিজের জীবনের বিনিময়ে প্রতিষ্ঠিত করতো হাজারো-লাখো মানুষের প্রত্যাশা। পক্ষান্তরে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে দেখা যায়, এর ব্যতিক্রম চিত্র। বাংলাদেশও তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল দেশ। এখানে একজন সাধারণ নাগরিক তার কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্য কিংবা শ্বশুরবাড়ি থেকে অধিক পরিমাণ যৌতুক নেওয়ার লোভে অত্যাচার করতে থাকে তার প্রিয় সহধর্মিনীর ওপর। যা আদিম যুগের পৈশাচিকতাকেও হার মানায়।

যৌতুক, নারী নির্যাতন, সভ্রমহানি, ধর্ষণ এগুলো থেকেই সমাজ কলুষিত হচ্ছে দিন দিন। আর কুপ্রবৃত্তিপরায়ণ লোকজন তা থেকে শিক্ষা নিয়ে পূরণ করছে নিজের অভিলাষ। যার করুণ পরিণতি পেট্রোল, কোরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে দিয়ে হত্যা করা হচ্ছে একজন নারীকে।